‘৯-১-১’

আব্দুর রহমান আবিদ
abid921@yahoo.com

না, নাইন ইলেভেন নয়। এটি আমরেকাবাসীদের কাছে যুগ যুগ ধরে খুব পরিচিত একটি সংখ্যা, নাইন ইলেভেনের আগে-পরেও। এটি আমরেরিকান পুলিশদের ইমার্জেন্সি টেলিফোন নাম্বার। আপনি আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে, যে কোন শহরে, যে কোন স্থানেই থাকুন না কেন, কোন বিপদে পড়লে শুধু এই নাম্বারটিতে ডায়াল করলেই হলো, চোখের নিমেষে পুলিশ হাজির হয়ে যাবে অকুস্থলে, অনেকটা আলাদীনের চেরাগের ‘জ্বিনি’র মতই। একজন আমেরিকান খুব ছোটখাট বিপদেও ভাত-মাছ খাওয়ার মতই (ভুল বললাম বোধহয়; বরং বলা ভাল পিজ্জা-বার্গার খাওয়ার মতই) ৯-১-১ এ কল্ করে। কিন্তু আমরা যারা অল্প কিছুদিন ধরে এদেশে আছি এবং ‘পুলিশ’ বলতে যাদের মানসপটে এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশী পুলিশদের ছবিই ভেসে ওঠে, তারা কিন্তু এত সহজে ৯-১-১ এ কল্ করিনে। সহজেই বা বলছি কেন, আমেরিকার মত দেশে বসেও ম্যালা বড়-সড় বিপদেও পুলিশ ডাকতে ভয় পাই আমরা। হাজার হলেও এতদিনের অভ্যাস বলে কথা। তারপরও সাহস করে একদিন ছোট্ট একটা বিপদে পড়ে দুরু দুরু বুকে ফোন করেছিলাম ৯-১-১ এ। আর সেই অভিজ্ঞতার কাহিনীই আজ শোনাবো পাঠকদেরকে।

‘এশিয়ান হালাল মিট্ মার্কেট’ এ গেছি মাংস কিনতে। আমার সাউথ জার্সির বাসা থেকে মাইল দুই/তিন দূরে হবে দোকানটা। মাংস কিনে গাড়ীতে ফিরে এসে চাবি দিয়ে গাড়ীর পেছনটা খুলতে গেলাম মাংস রাখার জন্যে। বিপদটা ঘটলো সেখানেই। কিভাবে যেন চাবীটা ভেঙে গেল। আমার গাড়ীর ডোর কী এবং ইগনিশন কী আলাদা আলাদা। গাড়ীর দরজাটা কোনভাবে খুলতে পারলে গাড়ী চালিয়ে সোজা বাসায় চলে যেতে পারবো। আর বাসায় তো আমার গাড়ীর স্পেয়ার ডোর কী আছেই। কিন্তু গাড়ীর দরজা খুলবো কিভাবে? এর আগে অনেকটা এ ধরনেরই একটা বিপদে পড়েছিলাম আরেকবার। নতুন চাকরি নিয়ে টেক্সাসের ডালাস থেকে নর্থ ক্যারোলাইনার র‍্যলীতে আসছি গাড়ী চালিয়ে। প্রায় দুদিনের পথ। পথে মিসিসিপি’র এক শহরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক মোটেলে উঠেছি রাত কাটানোর জন্যে। গাড়ী থেকে নামার সময় কিভাবে যেন ভেতরে চাবী রেখেই লক লাগিয়ে দিয়েছি গাড়ীর। কি করা! মোটেলের রিসেপশনিষ্ট মেয়েটি পরামর্শ দিলো স্থানীয় কোন ‘লক স্মিথ’ কে কল্ করতে। টেলিফোন গাইড ঘেটে ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এমন কয়েকটা ‘লক স্মিথ’ কোম্পানীকে কল্ করলাম। সবচে মিনিমাম রেইট পেলাম সম্ভবতঃ ৪২ ডলার (দু’তিন বছর আগেকার ঘটনা; ঠিক মনে নেই টাকার অংকটা কত ছিল)। ফোন করার আধা ঘন্টা/৪৫ মিনিট পর ‘লক স্মিথ’ এসে আমার গাড়ীর লক খুলে দিয়ে গেলো। পরে পরিচিতদের কাছে শুনেছি আমি নাকি খুব লাকি ছিলাম। দূরের রাস্তায় গাড়ীর লক সংক্রান্ত এ জাতীয় সমস্যায় পড়লে অন্ততঃ শ’ খানেক ডলার না খসিয়ে নাকি এসব পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

তো যা বলছিলাম। ডোর কী ভেঙে খানিকটা দুশ্চিন্তায়ই পড়লাম। বিকেল সাড়ে পাঁচটার মত বাজে। ইলিয়াস ভাই কাজ থেকে ফেরেন ছ’টার দিকে। ঠিক লাগোয়া প্রতিবেশী না হলেও আমার বাসা থেকে এমন বেশী দূরও না উনার বাসা। ইলিয়াস ভাই হলো সত্যিকারের ‘বিপদের বন্ধু’। শুধু আমারই নয়, আশ-পাশের প্রায় সব বাংলাদেশীদেরই ‘বিপদের বন্ধু’ হলো তিনি। উনি কাজ থেকে বাসায় ফিরে এলে উনাকে শুধু ফোন করে দিলেই হবে, ব্যস আমার বাসা থেকে স্পেয়ার ডোর কীটা পিক আপ করে এনে আমাকে মুহূর্তেই উদ্ধার

করবেন উনি। খুব 'বিগ্ ডিল্'ও হয়ত নয় ব্যাপারটা। তারপরও ইচ্ছে হলো না ইলিয়াস ভাইকে কষ্ট দিতে। হাজার হলেও কাজ থেকে ফিরে বেচারা টায়ার্ড থাকবেন। কাজেই গাঁটের গোটা কয়েক ডলার খসানোর সিদ্ধান্ত নিলাম শেষ পর্যন্ত। হালাল মাংসের দোকানে ফিরে গিয়ে পাকিস্তানী দোকানদারটিকে জিজ্ঞেস করলাম আশ-পাশে কোন 'লক স্মিথ' এর খবর সে জানে কিনা এবং তার টেলিফোনটা আমি ব্যবহার করতে পারবো কিনা। দোকানদার আমাকে খুবই আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে ৯-১-১ এ কল্ করতে বললো। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। ভেঙেছে আমার গাড়ীর ডোর কী - ডাকতে হবে 'লক স্মিথ', পুলিশ কেন? তাছাড়া পুলিশ ডেকে যদি নতুন করে কোন ঝামেলায় আবার জড়িয়ে পড়ি - পুলিশ বলে না কথা! আর পুলিশ এসেই বা কি করবে? তারাও নিশ্চয় আমাকে বলবে কোন 'লক স্মিথ' কে ডাকতে। বরং সেক্ষেত্রে হয়ত পুলিশের সামনে 'লক স্মিথ' এর সাথে দর কষাকষি করার সুযোগটাও পাবো না। ওদিকে দোকানদার লোকটিও নাছোড়বান্দা - না, পুলিশকেই তুমি কল্ করো আগে। এ দেখি নতুন বিপদ। আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, অযথা গ্যাঞ্জাম-ট্যাঞ্জামকে ভয় পাই। কিন্তু দোকানদার ব্যাটা যেভাবে লেজে-গোবরে ব্যাপারটাকে জড়িয়ে ফেলেছে তাতে পুলিশকে ফোন না করেও উপায় নেই। আর যাই হোক একজন বাংলাদেশী হিসেবে একজন পাকিস্তানীর সামনে নিজের দূর্বলতাকে তো আর প্রকাশ হতে দেয়া যায়না। কাজেই মনে মনে খুব সাহস সঞ্চয় করে দুরু দুরু বুকে টেলিফোনের ৯-১-১ খচিত বাটন তিনটিতে চাপ দিলাম আমেরিকার জীবনে প্রথম বারের মত। ওপাশ থেকে মসৃন একটি নারীকন্ঠ ভেসে এলো। এক নিঃশ্বাসে গাড়ীর ডোর কী ভাঙার বিষয়টি তাকে বলে গেলাম কোনরকম না থেমে। নিজের ইংরেজীর উপর কোন কালেই তেমন আস্থা নেই আমার। তার উপর কথা বলছি এক মহিলা পুলিশের সাথে। কাজেই আমার ঘোর সন্দেহ ছিল মহিলা আমার কথা আদোতেই বুঝতে পারবে কিনা। আমাকে অবাক করে দিয়ে মহিলা একবারও বললো না 'ছে ইট এগেইন' কিম্বা 'পার্ডন মি' কিম্বা 'আই কুডুন্ট গেট ইউ'। বরং খুব আন্তরিকভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলো - "তুমি এখন কোথায়?" আমি সংক্ষেপে হালাল মিট দোকানটির ঠিকানা এবং লোকেইশন তাকে বললাম। ভদ্রমহিলা বললো - "দ্যাখো, তোমার গাড়ীর লক্ খুলতে যে টুল্ দরকার আমাদের কাছে আপাততঃ তা নেই। তবে ফায়ার সার্ভিসের ওদের কাছে আছে। তুমি লাইনে থাকো, আমি ওদের সাথে তোমাকে ফোনে কানেক্ট করে দিচ্ছি। আর হ্যা, তুমি কিন্তু লাইনটা ছেড়ে দিওনা।" আমি যেন ফোনটা ছেড়ে না দিই, সে জন্যে "হোল্ড অন" কথাটি বেশ কয়েকবারই বললো সে। কে জানে আমার গলা শুনে হয়ত আমার ঘাবড়ে যাবার ব্যাপারটা খানিকটা আঁচ করে থাকবে সে।

ফায়ার সার্ভিসের ওদের সাথে কথা বলে ফোনটা রেখে দিয়েছি বোধ হয় মিনিট পাঁচেক হবে, দেখি ফায়ার সার্ভিসের বিশাল এক লাল রঙা গাড়ী নিয়ে পাঁচজন ফায়ার ফাইটার হাজির। দেখলে মনে হবে কোথাও বোধহয় আগুন-টাগুন লেগেছে। অফিসার মত যিনি, আমার কাছে এগিয়ে এসে দু'একটা কাগজে আমার সই-টই নিয়ে নিলেন। এটা একটা ফরম্যালিটি; গাড়ীর লক খুলতে গিয়ে আমার গাড়ীর কোন ক্ষতি-টতি হয়ে গেলে যেন আবার ক্ষতিপূরন চেয়ে না বসি - এই সব আর কি। সই-টই দেয়া শেষ করা মাত্রই দু'তিন জন ফায়ার ফাইটার ত্বরিৎ ছুটে গেল আমার গাড়ীর দিকে। মুহূর্তেই খুলে দিলো আমার গাড়ীর দরজা। না, এর সাথে ফি-টি'র কোন সম্পর্ক নেই। এটা আমেরিকানদের নাগরিক অধিকার। পুলিশের উপর, ফায়ার সার্ভিসের উপর তাদের নাগরিকত্বের দাবী।

আমাদের দেশের পুলিশের কাছ থেকে, ফায়ার সার্ভিসের কাছ থেকে এ জাতীয় কোন সাহায্য পাওয়া কি কল্পনাও করা যায়? একজন সাধারন আমেরিকানের কাছে পুলিশ মানেই নির্ভরতা, পুলিশ মানেই নিশ্চিত আশ্রয়স্থল। অথচ আমাদের দেশে! - ঠিক এর উল্টোটা । কে আমাদের পুলিশদের আজকের এই বিপরীত

চরিত্রের জন্যে দায়ী? তা কি শুধু পুলিশরা নিজেরাই? তাই যদি হবে তাহলে তো দীনেশ দারোগা নিজের জীবনকে এভাবে উৎসর্গ করতেন না; সন্ত্রাসী ধরতে গিয়ে, অন্যের জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনকে এভাবে বিলিয়ে দিতেন না এস. আই. হুমায়ুন কবির। পুলিশ বাহিনীর আরও কত নামহীন বীর এভাবে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন আর উৎসর্গ করেছেন যুগে যুগে তাদের অনেকের কাহিনী আমরা তো জানিও না। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সেটাই ভেবে দেখতে হবে আমাদের এখন। একদিকে বেতনের স্বল্পতা আর সর্বগ্রাসী দূর্নীতির বন্যা, এবং অপরদিকে নষ্ট চরিত্রের দূর্বৃত্ত রাজনীতিবিদ যাদের অহর্নিশি প্রয়োজন অসৎ পুলিশী মদদ আর সাহায্য। এই দুই জিনিষ যেন একে অপরের পরিপূরক। আর এই দুয়ের কম্বিনেশনেই দূর্নীতির বন্যায় ভেসে গেছে আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনীর চরিত্র। তবে আশার কথা, দীনেশ দারোগা, এস. আই. হুমায়ুন কবিরের মত মানুষ পুলিশ বাহিনীতে আজও কেউ কেউ আছেন। খুঁজলে রাজনীতিবিদদের মাঝেও হয়ত দু'এক জনকে এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে যারা দেশকে সত্যিকারভাবে আজও ভালবাসেন। আমাদের শুধু প্রয়োজন এই মানুষগুলোকে খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে একত্রিত করা। কাজটা নিঃসন্দেহে দুরূহ। আপাতঃ দৃষ্টিতে হয়ত অসম্ভবও। তারপরও পৃথিবীতে কত অসম্ভবও তো সম্ভব হয়। সুন্দর ভবিষ্যতের আশা এবং স্বপ্নই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আমরা কি স্বপ্ন দেখতেও ভুলে গেছি??

সবাইকে ধন্যবাদ।।